ভূমিকা

শিশু ও কিশোর সাহিত্য সমগ্র-র ভূমিকা লেখার কথা ছিল প্রণম্য কবি শঙ্খ ঘোষের। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় অসুস্থ কবির সঙ্গে শেষ অনেকক্ষণ টেলিফোনে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তিনি স্বয়ং ফোন করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারি স্নেহাশিস পাত্রের প্রয়োজনীয় সহায়তায়। তাঁর লেখাটা কবে পেলে কাজ হবে জানতে চেয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, মে মাসের গোড়ায় তিনি শিশু ও কিশোর সাহিত্য সমগ্রের ভূমিকা লিখবেন।

মে মাসের কিছুদিন আগে, একুশে এপ্রিল আমাদের সবাইকে ছেড়ে তিনি চলে গেলেন অমরতার দেশে। তাঁর সেই লেখাটা না হওয়া বাংলা ভাষার পক্ষে এক মস্ত বড় ক্ষতি বলেই মনে হয়। শিশু ও কিশোর সাহিত্য সমগ্রের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি হয়তো শিশু সাহিত্যের নতুন মাত্রা ও মূল্য আমাদের চেনাতেন।

অগত্যা বইয়ের ভূমিকায় আমাকেই দুয়েক কথা লিখতে হচ্ছে। সে লেখাও হবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মতোই।

''আপনার 'শাদা ঘোড়া' আমরা চারজনই পড়লাম। 'শাদা ঘোড়া' আর 'ঋষিকুমার'— বইয়ের দুটি লেখার কোনটি বেশি ভালো তা নিয়ে সকলে একমত হওয়া গেল না।''

১৯৭৯-তে বই প্রকাশের পর এটিই 'শাদা ঘোড়া'র পাঠকের প্রথম চিঠি। চিঠির লেখক শঙ্খ ঘোষ। চারজন হলেন শঙ্খ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী প্রতিমা ঘোষ ও তাঁদের দুই বালিকা কন্যা মিঠি ও টিয়া।

'শাদা ঘোড়া' এর আগে ১৯৭৪-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় সোমবারের শেষ পৃষ্ঠা 'আনন্দমেলা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ হবার পরই, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বই হয়ে বেরবার বেশ কিছু আগে, সত্যজিৎ রায় 'শাদা ঘোড়া' নিয়ে ছবি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন। কয়েকটি বাস্তব অসুবিধায় শেষ পর্যন্ত তাঁর সে ভাবনা বাদ দিতে হয়েছিল। একটা অসুবিধার কথা বলেছিলেন, ''এই বাড়ির নীচের আউট হাউসকে আস্তাবল বানিয়ে সেখানে দুমাস বয়েসের একটা স্ট্যালিয়নকে সহিস রেখে ছ'মাস পুষতে পারলে তবেই এ ছবি করা সম্ভব।'' আরেকটা বড় সমস্যাও উল্লেখ করেছিলেন, ''ট্রাইবাল চিফের গ্রামে শ্যুটিং করতে ৮০% অব মাই সেলুলয়েড উইল বি এক্সপোজ্‌ড।''

''ট্রাইবাল চিফের গ্রাম? আছে না কি এই গল্পে?''

আমার সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন শুনে তাঁর সহজ উত্তর, ''ওই যে নদীর ওপারে, যাঁদের বাঁশির সুর যতদূর যায়, তীরও তত দূর যায়।''

তাই তো, গল্পে বাঁশের ভেলায় নদী পেরিয়ে ওই রকমই এক আদিবাসীদের গ্রামে যাবার কথাই তো আছে।

বই হবার আগেই 'শাদা ঘোড়া' নিয়ে চারদিকে শোরগোল দেখে আমি ভেবেছিলাম, খবরের কাগজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনও গল্প বেরলে, তা নিয়ে এমন হইচই হওয়াটাই হয়তো রীতি।

বই হবার পর প্রশংসার বান ডাকল বললেই হয়। প্রচুর চিঠি পেতাম। সকলেরই চিঠিতে নানা ভাবে ভালো লাগার উচ্ছ্বাস পড়ে আনন্দও যেমন হত, সংকোচ-ও বোধ করতাম তেমনই।

তারপর তো ভারতের নানা ভাষায় 'শাদা ঘোড়া'র গল্প ছড়িয়ে গেল। ইংরেজি ছাড়াও, জর্মান, জাপানি, জর্জিয়ান বা মোঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদ হতে লাগল। কোথাও রঙিন ছবি দেওয়া বইয়ের আকারে, কোথাও সে-দেশের বিশিষ্ট কোনও পত্রিকার পাতায়।

'শাদা ঘোড়া'র সাত বছর পর লেখা 'হীরু ডাকাত'। বেশ কয়েকবার পুনর্মুদ্রণের পর বইটির কোথাও কোনও ছন্দের ভুলচুক রয়ে গেছে কি না দেখার অনুরোধ করে সেটি পাঠিয়েছিলাম শঙ্খ ঘোষের কাছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিজেই তিনি ফোনে বললেন, ''ভুল তো কোথাও নেইই, বরং অনেক দিন পর আরেকবার পড়ে আরও ভালো লাগল।'' একটু থেমে আবার বললেন, ''হীরু ডাকাত আপনি লিখলেন কী করে?'' কী আর বলব, চুপ করে থাকলাম। একটু পরে উনিই বললেন, ''কী করে যেন লেখা হয়ে গেল!'' বছর পাঁচেক আগে 'গরিলার চোখ' বইটি শিশুসাহিত্যে সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার পাওয়ায় দূরদর্শন বাড়ি এসে আমার যে সাক্ষাৎকার নিলেন, সেখানে পুরস্কার পেয়ে আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শঙ্খবাবুর এই ফোনালাপের কথাটা শুনিয়ে বললাম, এর পর আর কোনও পুরস্কার আমার মনে তেমন সাড়া জাগায় না। আমাকে টেলিফোনে বলা তাঁর কথাটা এভাবে ক্যামেরার সামনে বলে একটু খারাপ লাগায় শঙ্খবাবুকে ঘটনাটা জানালাম। সব শুনে তিনি বললেন, ''হীরু ডাকাত যত বেশি মানুষ জানবে, ততই ভালো। সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে শুধু নয়, আমাদের সমাজের পক্ষেও।''

এর অনেক বছর আগে আমার 'তালগাছের ডোঙা' বইয়ের উৎসর্গপত্রে—

আমি তখন তেরো দিনের, দাদার তখন নয়
তখনই তার কোন্ নিয়মে যাবার সময় হয়?
আমি এখন অর্ধশতক, আমার চুলে শাদা
নয় বছরের সেই বালকটি আজও আমার দাদা

পড়ে বলেছিলেন, আমাদের অশ্রদ্ধাপ্রবণ দিশাহারা সমাজে এরকম কথার এখন দরকার।

এই ২০২১-এর ১২ ফেব্রুয়ারিও অন্য প্রসঙ্গে তাঁর একটি লেখায় পাই ''অমরেন্দ্র চক্রবর্তী হলেন সেই শিশুসাহিত্যিক যাঁর 'হীরু ডাকাত'-এর মতো অনবদ্য সৃষ্টি বছরের পর বছর ছোটোবড়ো সবারই মনোরঞ্জন করে চলেছে— শুধু 'হীরু ডাকাত'ই নয় অবশ্য, গদ্যে কিংবা ছন্দে বাঁধা তাঁর আরো অনেক রচনাই বড়োমাপের এক শিশুসাহিত্যিক হিসেবেই সাহিত্যসমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।''

ছোটদের জন্য আমার তৃতীয় বই 'গৌর যাযাবর' লেখার ছোট একটা ইতিহাস বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা। একদিন দুপুরে ইংরেজি সাহিত্যের বিদুষী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য আমার বন্ধু, বিশ্বসাহিত্যের আশ্চর্য সব কিশোরগ্রন্থের বিখ্যাত অনুবাদক ও অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর নতুন কিশোর পত্রিকা 'লালকমল নীলকমল'-এর জন্য ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার দায় চাপাতে না পেরে অগত্যা একটা গল্প লেখার ভার দিয়ে বসলেন। ভার তো দিলেন, কিন্তু আমার লেখার কী আর অত ধার আছে যে বসলাম আর লিখে ফেললাম। অফিসের কাজের ব্যস্ততায় লেখার কথাটা যতই ভুলে থাকার চেষ্টা করি, বার বার টেলিফোনের তাগাদায় ভোলবার উপায় থাকে না। শেষপর্যন্ত এক রাতে গৌরের গল্প লিখে ফেললাম। 'গৌর যাযাবর'-এর শুধু প্রথম অংশটা নিয়ে পাঁচ-ছ'পাতার ছোট্ট একটা গল্প।

এর কয়েক বছর পর, ১৯৮৭ সালের শীতের এক বিকেলে, অফিসের কাজে দিল্লির প্লেন ধরবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক ও শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর টেলিফোন। প্রতিক্ষণ

প্রকাশনী থেকে সামনের বইমেলায় আমার একটা ছোটদের বই বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বই বের করার সিদ্ধান্ত হলেই বইটাও যে লেখা হয়ে যায় না, এই সহজ যুক্তিটাই আমাকে দিতে হল। তাছাড়া ফ্লাইট মিস করার আশংকাও বুঝিয়ে বললাম।

''বাজে কথা রাখো। এই নাও, প্রিয়ব্রত তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'' ভাবখানা— বোঝো এবার ঠ্যালা!

প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ প্রকাশনীর কর্ণধার, সাদামাটা ভাষায় এককথায় জানালেন, ''বইয়ের নামটা বলে যান। প্লেনে উঠে গল্পটার কথা ভাবুন। আমরা প্রচ্ছদটা করিয়ে রাখি।''

পরদিন দিল্লি থেকে ফিরে যতবার যত ভাবেই 'না' 'না' করি, পূর্ণেন্দুদাও ততই নাছোড়বান্দা। অতএব গৌরের আরও দুটো গল্প নিয়ে নতুন দুটো পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে কোত্থেকে খবর পেয়ে 'আজকাল'-এর তখনকার চমৎকার 'ছোটদের পাতা'র সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি নন্দী সোজা দাবি করে বসলেন, বই হবার আগে গৌরের গল্প তক্ষুনি তাকে দিতে হবে, প্রথমে 'ছোটদের পাতা'য় ধারাবাহিক ছাপা হবে। লেখাটা প্রতিক্ষণের জন্য, বইমেলারও খুব আর দেরি নেই, এখন ধারাবাহিক প্রকাশের সময় কোথায়? ধ্রুবজ্যোতির উত্তর, বইমেলার আগেই 'আজকাল'-এ ছাপা হবে, কয়েক সংখ্যা ধরে ছাপাবার সময় না থাকলে, এক সংখ্যায় যতটা আঁটে ততটাই ছাপা হবে। ধ্রুবজ্যোতি লেখাটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে এসে বললেন, লেখাটা জোর করে শেষ করে দিলেন কেন? গৌরের জীবনে আরও ঘটনা তো ঘটবেই। সেটা লিখে ফেলুন। আমি দু-তিনদিন পরে এসে নিয়ে যাব।

অতএব চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বই হবার বোধহয় পরের বছর বিশ্বভারতীতে বাংলা ভাষায় আগের বছরের শ্রেষ্ঠ ছোটদের বই হিসেবে 'গৌর যাযাবর'-এর জন্য পুরস্কার নেবার সময় এ-বইয়ে আমি যে আমার কাজ শেষ করতে পারিনি, লেখকের সেই অক্ষমতা ও রচনার কয়েকটি শৈথিল্য বিনীতভাবে আমাকে বিবৃত করতে হল। শুনে সভায় উপস্থিত গুণীজনদের একজন সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন, বইটিকে এভাবে যদি আপনি তুচ্ছ করতে থাকেন তাহলে যাঁরা এ-বই পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করেছেন তাঁদের কী মনে হবে? এ তো তাঁদের সাহিত্যরুচির প্রতিই আপনার অনাস্থার প্রকাশ। ভর্ৎসনাকারী আর কেউ নন, স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ। তাঁর এই কথা শোনার পর এ বই নিয়ে আমি আর কখনও কোনও কথা বলিনি। বরং গৌর যাযাবরের জীবনের নতুন অভিজ্ঞতার কাহিনি নিয়ে 'ছেলেবেলা' পত্রিকায় পঁচিশ বছর পর পঞ্চম পরিচ্ছেদ লিখতে হল।

অনেকেরই অজানা এরকম কয়েকটা তথ্য জানাতেই আমার কথাটি ফুরলো।

আরও কিছু কথা বলেছেন চিরস্মরণীয় কবি-সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং ভাষাতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ, ছড়াকার পবিত্র সরকার ও ওপার বাংলার কবি-উপন্যাসিক ওমর কায়সর ও শিশুসাহিত্যিক, গবেষক খন্দকার মাহমুদুল হাসান।

আমার শিশু ও কিশোর সাহিত্য নিয়ে এভাবে সমগ্র প্রকাশের কল্পনাই যখন কারও মনে আসেনি, সেই তখনকার লেখা এইসব। শেষ দুটি ছাড়া। মনে হয় তাঁরা যেন এই শিশু ও কিশোর সাহিত্য সমগ্রের ভূমিকাই আগাম লিখে রেখেছেন।

কলকাতা
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২